ক. নামকরণ:

চাঁপাইনবাবগঞ্জ নামটি সাম্প্রতিককালের। ইতোপূর্বে এই এলাকা ‘নবাবগঞ্জ’ নামে পরিচিত ছিল। চাঁপাইনবাবগঞ্জের নামকরণ সম্পর্কে জানা যায়, প্রাক-ব্রিটিশ আমলে এ অঞ্চল ছিল মুর্শিদাবাদের নবাবদের বিহারভূমি এবং এর অবস্থান ছিল বর্তমান সদর উপজেলার দাউদপুর মৌজায়। নবাবরা তাঁদের পাত্র-মিত্র ও পারিষদসহ এখানে শিকার করতে আসতেন বলে এ স্থানের নাম হয় নবাবগঞ্জ। বলা হয়ে থাকে যে, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সরফরাজ খাঁ (১৭৩৯-৪০ খ্রি) একবার শিকারে এসে যে স্থানটিতে ছাউনি ফেলেছিলেন সে জায়গাটিই পরে নবাবগঞ্জ নামে পরিচিত হয়ে উঠে। তবে অধিকাংশ গবেষকের মতে, নবাব আলীবর্দী খাঁর আমলে (১৭৪০-৫৬ খ্রি) নবাবগঞ্জ নামকরণ হয়।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম ও মধ্যভাগে বর্গীর ভয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে লোকজন ব্যাপকভাবে এ এলাকায় এসে বসতি স্থাপনের ফলে স্থানটি এক কর্মব্যস্ত জনপদে পরিণত হয়। কালক্রমে নবাবগঞ্জের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। নবাবগঞ্জের ডাকঘর চাঁপাই গ্রামে অবস্থিত হওয়ায় নবাবগঞ্জ তখন ‘চাঁপাইনবাবগঞ্জ’ নামে পরিচিত হয়।

ইতিহাসসূত্রে এই ‘চাঁপাই’ নামকরণের কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এ ব্যাপারে দুরকম জনশ্রুতি প্রচলিত রয়েছে:-

১. বর্তমান নবাবগঞ্জ শহর থেকে ৫/৬ মাইল দুরে মহেশপুর নামে একটি গ্রাম রয়েছে। নবাব আমলে এই গ্রামে চম্পাবতী মতান্তরে‘চম্পারাণী’ বা ‘চম্পাবাঈ’ নামে এক সুন্দরী বাঈজি বাস করতেন। তাঁর নৃত্যের খ্যাতি আশেপাশে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি নবাবদের প্রিয়পাত্রী হয়ে ওঠেন। তাঁর নামানুসারে এই জায়গার নাম ‘চাঁপাই’ হয় বলে অনেকে মনে করেন।

২. ‘চাঁপাই’ নামকরণের আর একটি প্রচলিত মত হচ্ছে-এ অঞ্চল রাজা লখিন্দরের বাসভূমি ছিল। লখিন্দরের রাজধানীর নাম ছিল চম্পক। কিন্তু এই চম্পক নগরীর প্রকৃত অবস্থান কোথায় ছিল এ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। যা হোকনবাবগঞ্জ জেলায় চসাই, চান্দপুর, বেহুলা গ্রাম ও বেহুলা নদীর সন্ধান পাওয়া যায়। বেহুলা নদী বর্তমানে মালদহ জেলায় প্রবাহিত হলেও দেশবিভাগ-পূর্বকালে চাঁপাই, মালদহ জেলার অধীনে ছিল। ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০ খ্রি) মনে করেন, বেহুলা তার স্বামীকে ভেলায় নিয়ে মহানন্দার উজান বেয়ে ভেসে গিয়ে ছিলেন। ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর (১৮৮৫-১৯৬৯ খ্রি) ‘বাঙলা সাহিত্যের কথা’ গ্রন্থের প্রথম খন্ডে বর্ণিত লাউসেনের শত্রুরা জামুতিনগর দিয়ে গৌড়ে প্রবেশ করে। বর্তমান ভোলাহাট উপজেলার জামবাড়িয়া পূর্বে জামুতিনগর নামে পরিচিত ছিল। এসবের ওপর ভিত্তি করে কোনো কোনো গবেষক চাঁপাইকে বেহুলার শ্বশুরবাড়ি চম্পকনগর বলে স্থির করেছেন এবং মত দিয়েছেন যে, চম্পক নাম থেকেই চাঁপাই নামের উৎপত্তি।

খ. প্রাচীনকালের চাঁপাইনবাবগঞ্জ (প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ১২০৪ খ্রি):

ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদগণ রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর এবং পশ্চিমবঙ্গের মালদহ ও মুর্শিদাবাদের কিছু অংশ এবং দার্জিলিং ও কোচবিহারসহ গঠিত সমগ্র অঞ্চলকে বরেন্দ্র এলাকা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এই এলাকাকে বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন অঞ্চল বলে মনে করার আরেকটি কারণ হচ্ছে বরেন্দ্র অঞ্চলেই সবচেয়ে প্রাচীন পুরাকীর্তি ও প্রত্নবস্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে। আর বরেন্দ্রভূমির ইতিহাসের সঙ্গে চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলের ইতিহাস জড়িত। একসময় উত্তরবঙ্গের সিংহভাগ এলাকা পুন্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ধারণা করা হয়, এই পুন্ড্রবর্ধনই পরবর্তীতে গৌড় নামে পরিচিত হয়ে উঠে। পর্যটক ইবনে বতুতার বিবরণী থেকে জানা যায় যে, এই শহর গঙ্গা ও করতোয়া নদীদ্বয়ের মধ্যে কোনো স্থানে অবস্থিত ছিল। অবশ্য গৌড় রাজ্য সম্পর্কে কিংবদন্তীর অন্ত নেই। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের জৈনদের গ্রন্থে প্রদত্ত বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মালদহ জেলার লক্ষ্মণাবতী গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভবিষ্যপুরাণে বা ত্রিকান্ডশেষ গ্রন্থে গৌড়কে পুন্ড্র বা বরেন্দ্রর অন্তর্গত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চগৌড়ের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ‘ব্রজতরঙ্গিনী’ গ্রন্থে পরবর্তীতে বহু গ্রন্থে পঞ্চগৌড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকদের মতে গৌড়, সারস্বত, কনৌজ, মিথিলা ও উৎকল নিয়েই এই পঞ্চগৌড়। কোনো এক সময় মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমানের কিয়দংশ ও মালদহ গৌড়ের অন্তর্গত ছিল । এ নিরিখে পন্ডিতগণ নবাবগঞ্জকে গৌড়ের অংশ হিসেবে মনে করেন।

গৌড়রাজ শশাঙ্কের সময় (আনুমানিক ৬০৬-৬৩৭ খ্রি) গৌড়ের অংশ হিসেবে চাঁপাইনবাবগঞ্জ তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড় রাজ্য সম্রাট হর্ষবর্ধন ও তাঁর মিত্র কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার অধীনে চলে যায়। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর বহিঃশত্রুর ক্রমাগত আক্রমণের ফলে গৌড়ের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে ‘মাৎস্যন্যায়’ নামের শতবর্ষব্যাপী এক অন্ধকার ও অরাজক যুগের সূচনা হয়। অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে গৌড় রাজ্যে মাৎস্যন্যায় যুগের অবসান ঘটে প্রথম পাল রাজা গোপালের (আনুঃ ৭৫০-৭৭০ খ্রি) ক্ষমতারোহণের মাধ্যমে। বাংলায় পাল শাসন প্রায় তিন শতাব্দীকাল স্থায়ী হয়েছিল। এরপর কর্ণাটক থেকে আগত ও রাঢ় অঞ্চলে বসবাসকারী সেন বংশ গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করে।

গ. মুসলিম শাসনামলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ (১২০৪-১৭৫৭ খ্রি):

ভাগ্যান্বেষী তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে নদীয়া জয় করেন। এর মধ্য দিয়ে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা ঘটে। মুসলিম আমলে গৌড় নগরী ‘লখনৌতি’ (লক্ষণাবতী) নামে পরিচিতি লাভ করে। ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনামলে বাংলাভাষী

সমগ্র ভূখন্ড ‘বাঙ্গালা’ নামের একক রাষ্ট্রের অধীনে আসে। তবে গৌড় তথা বাংলার ইতিহাসের স্বর্ণযুগ ধরা হয় হোসেন শাহী বংশের শাসনকালকে। আর স্বাভাবিকভাবেই গৌড়ের পাদভূমি হিসেবে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জনপদ তখন অভাবনীয় বৈষয়িক সমৃদ্ধি অর্জন করে। মধ্যযুগের বাংলার শ্রেষ্ঠ নরপতি সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহর (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি) রাজত্বেই মূলত চাঁপাইনবাবগঞ্জ গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হয়। আর সেই গৌরবের সাক্ষী হিসেবে আজও টিকে আছে গৌড়ের বিখ্যাত ছোট সোনামসজিদ।

১৫৭৬ খ্রি: মুঘল সম্রাট আকবরের বাংলা বিজয়ের পর থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জসহ উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের বেশিরভাগ এলাকা মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার কিছু কিছু এলাকায় তখন বার ভুঁইয়ারা মুঘলবিরোধী প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। যা হোক, মুঘল সুবাদারদের মধ্যে শাহাজাদা মুহম্মদ সুজার (১৬৩১-৫৯ খ্রি) বেশ কিছু কীর্তি চাঁপাইনবাবগঞ্জে রয়েছে। তাঁর কাছারী বাড়ির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে শিবগঞ্জ উপজেলার ফিরোজপুরে। তাঁর সময় গৌড়ের পূর্বাঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য হযরত শাহ নেয়ামতুল্লাহ (রঃ) এখানে আসেন। সুবাদার সুজা তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা জানান। পরে শাহ নেয়ামতুল্লাহ গৌড় নগরীর উপকণ্ঠে ফিরোজপুরে স্থায়ীভাবে আস্তানা স্থাপন করেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি) পর থেকে মুঘল সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তখন থেকে বাংলা নবাবদের অধীনে একটি স্বাধীন রাজনৈতিক সত্তার মর্যাদা ভোগ করতে থাকে। নবাব মুর্শিদকুলি খানের (১৭১৭-১৭২৭ খ্রি) সময় বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে স্থানান্তর করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসা হয় যা ভৌগোলিক দূরত্বের দিক থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জের অধিকতর নিকটবর্তী। পূর্বেই বলা হয়েছে, নবাবি আমলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকা নবাবদের মৃগয়াভূমি হিসেবে মুর্শিদাবাদের অভিজাত মহলে বেশ পরিচিত হয়ে ওঠে এবং ‘নবাবগঞ্জ’ নামটি মূলত ঐ সময়েই জনপ্রিয়তা লাভ করে।

ঘ. ব্রিটিশ যুগ (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রি):

১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বাধীন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলা-ভারতে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের বীজ রোপিত হয়। বাংলার রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতিতে নেতিবাচক রূপান্তর ঘটে এবং নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদের পশ্চাদভূমি হিসেবে চাঁপাইনবাবগঞ্জ যে গুরুত্ব বহন করত, তাতে ভাটা পড়ে। তবে এ কথাও সত্যি যে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় বর্তমানে আমরা যে গ্রামীণ ও শহুরে জনপদ কাঠামো দেখতে পাই তার সিংহভাগই ব্রিটিশ যুগে তৈরি। অবশ্য নবাবগঞ্জ অঞ্চলের ইতিহাস খুব প্রাচীন হলেও নবাবগঞ্জ থানা শহর ও মহকুমা শহরের ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে পুর্ণিয়া ও দিনাজপুর জেলা

ভেঙ্গে মালদহ জেলা গঠিত হয়, কিন্তু ১৮৫৯ খ্রিঃ পর্যন্ত এটিকে কোন কালেক্টরের অধীনে দেয়া হয়নি। Mr. Ravan Showছিলেন মালদহ জেলার প্রথম জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর। এ সময় শিবগঞ্জ ও কালিয়াচক থানাদ্বয় অপরাধপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে কুখ্যাত ছিল। নবাবগঞ্জ তখন শিবগঞ্জ থানার অধীনে একটি পুলিশ ফাঁড়ি ছিল মাত্র। ১৮৭৩ খ্রিঃ মুন্সেফ চৌকি শিবগঞ্জ থেকে নবাবগঞ্জে স্থানান্তরিত হয় এবং তারও কিছুদিন পর ১৮৯৯ খ্রিঃ নবাবগঞ্জ থানায় উন্নীত হয়। থানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই নবাবগঞ্জ ও তার পার্শ্ববর্তী থানাগুলো নিয়ে একটি স্বতন্ত্র মহকুমা গঠনের পরিকল্পনা ও প্রয়াস চলতে থাকে। ১৮৭৬ খ্রিঃ পর্যন্ত নবাবগঞ্জ অঞ্চল রাজশাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ১৮৭৬-১৯০৫ খ্রিঃ সময়ে বিহারের ভাগলপুরের (বিভাগ) অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইতোমধ্যে ১৯০৩ সালে ১২ জন ওয়ার্ড কমিশনারের সমন্বয়ে নবাবগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়। ১৯০৫ খ্রিঃ বঙ্গভঙ্গের সময় তদানীন্তন পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশসহ এ অঞ্চলটি আবার অঞ্চল রাজশাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যদিও তা মালদহ জেলার অন্তর্গত থাকে। ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে নবাবগঞ্জে সাবরেজিস্ট্রি অফিস স্থাপিত হলে এখানে কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়। সরকারি কাজকর্মের সুবিধার জন্য ‘চাঁপাই’ গ্রামে অবস্থিত ডাকঘরটি ১৯২৫ সালে নবাবগঞ্জ শহরে স্থানান্তর করা হয় এবং তার নাম রাখা হয় চাঁপাইনবাবগঞ্জ। সে সময় থেকেই নবাবগঞ্জ শহর চাঁপাইনবাবগঞ্জ নামে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠে।

ঙ. পাকিস্তান ও বাংলাদেশ যুগ (১৯৪৭-বর্তমান সময়):
১৯৪৭ সালে ভারতবিভাগের সময় র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ অনুসারে নবাবগঞ্জ এবং তার পার্শ্ববর্তী শিবগঞ্জ, নাচোল, ভোলাহাট ও গোমস্তাপুর থানাকে মালদহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পূর্ব পাকিস্তানের রাজশাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শাসন ব্যবস্থার সুবিধার্থে ১৯৪৮ খ্রিঃ ১লা নভেম্বর রাজশাহী জেলার একটি থানা ও দিনাজপুরের অন্তর্ভুক্ত পোরশা থানাসহ একটি নতুন মহকুমার সৃষ্টি হয় এবং নবাবগঞ্জ শহরে মহকুমা সদর দপ্তর স্থাপিত হয় । এই নতুন মহকুমার নাম রাখা হয় ‘নবাবগঞ্জ’। নবাবগঞ্জ মহকুমা ঘোষিত হওয়ার পর প্রথম মহকুমা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সৈয়দ আহমদ চৌধুরী, ইপিসিএস (১৯৪৮-১৯৪৯ খ্রিঃ)।
১৯৮২ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ প্রশাসনকে জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার ঘোষণা দিয়ে থানাগুলোকে উপজেলা এবং মহকুমাকে জেলায় রূপান্তরিত করেন। এই পদক্ষেপের কারণে নবাবগঞ্জের ৫টি থানা শিবগঞ্জ, নাচোল, ভোলাহাট, গোমস্তাপুর ও নবাবগঞ্জ সদর উপজেলায় উন্নীত হয়। ১৯৮৪ সালের ১ মার্চ নবাবগঞ্জ মহকুমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে জেলা ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক মন্ত্রী মেজর জেনারেল এম. শামসুল হক চাঁপাইনবানগঞ্জ জেলা উদ্বোধন করেন। নবাবগঞ্জ জেলার প্রথম জেলা প্রশাসক নিযুক্ত হন এ. কে. শামছুল হক। তিনি ০১.০৩.১৯৮৪ খ্রিঃ থেকে ০৮.০৮.১৯৮৫ খ্রিঃ পর্যন্ত জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেন। জেলাবাসীর দাবির মুখে ২০০১ সালের ১লা আগস্ট সরকারিভাবে নবাবগঞ্জ জেলার নাম পরিবর্তন করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ রাখা হয়।

মুক্তিযুদ্ধকালীন বিশেষ ঘটনাঃ

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে চাঁপাইনবাবগঞ্জবাসীর অংশগ্রহণ ছিল সর্বাত্মক ও স্বতঃস্ফূর্ত। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা ও জনসাধারণের বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ে মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরকে পাকবাহিনীর কবল থেকে মুক্ত করা সম্ভব হয়। ১০ ডিসেম্বর তারিখে মুক্তিযোদ্ধারা মহানন্দা নদীর অপর পাড় থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহর দখলের জন্য অগ্রসর হন। ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর তৎকালীন সেক্টর কমান্ডার কাজী নুরুজ্জামানের নির্দেশে প্রায় পঞ্চাশজন যোদ্ধার এই দলের নেতৃত্ব দেন। মহানন্দা তীরের বারঘরিয়া গ্রামে এসে উপস্থিত হলেও ১৩ ই ডিসেম্বরের পূর্বে তিনি নদী পার হয়ে শহরে প্রবেশ করতে পারেননি। ঐদিন রাতে ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর তাঁর বাহিনীকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে শহর আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি নিজে একটি অংশের নেতৃত্বে থাকেন এবং সহযোদ্ধাদেরকে নিয়ে গভীর রাতে মহানন্দা পেরিয়ে শহরের উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হন। রেহাইচর নামক স্থানে শত্রুসেনাদের সঙ্গে তাঁর লড়াই হয়। বীরদর্পে যুদ্ধ করে ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর যখন পাকবাহিনী ও তাদের দোসরদেরকে রণাঙ্গন থেকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করছিলেন, তখনই শত্রুর নির্মম বুলেট এসে তাঁর কপালে বিদ্ধ হয়। শহীদ হন ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর। তাঁর বীরত্বপূর্ণ লড়াই ও সাহসী রণপরিকল্পনার কারণে ১৪ ই ডিসেম্বর তারিখে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরকে মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুমুক্ত করতে সক্ষম হন। শহীদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিনজাহাঙ্গীরকে ঐতিহাসিক ছোট সোনা মসজিদ প্রাঙ্গণে সমাধিস্থ করা হয়। বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের বীরত্বগাঁথা অমর হয়ে আছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ তথা বাংলাদেশের মুক্তিপাগল জনগণের হৃদয়ে।

জেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জঃ

১৯৮২ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ প্রশাসনকে জনগনের দ্বারগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার ঘোষণা দিয়ে থানাগুলোকে উপজেলা এবং মহকুমাকে জেলায় রূপান্তরিত করেন। এই পদক্ষেপের কারণে নবাবগঞ্জের ৫ টি থানা শিবগঞ্জ, নাচোল, ভোলাহাট, গোমস্তাপুর ও নবাবগঞ্জ সদর উপজেলায় উন্নীত হয়। ১৯৮৪ সালের ১ লা মার্চ নবাবগঞ্জ মহকুমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে জেলা ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক মন্ত্রী মেজর জেনারেল এম. শামসুল হক চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা উদ্বোধন করেন। নবাবগঞ্জ জেলার প্রথম জেলা প্রশাসক নিযুক্ত হন এ. কে শামছুল হক। তিনি ০১.০৩১৯৮৪ খ্রিঃ থেকে ০৮.০৮.১৯৮৫ খ্রিঃ পর্যন্ত জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেন। জেলাবাসীর দাবির মুখে ২০০১ সালের ১ লা আগস্ট সরকারীভাবে নবাবগঞ্জ জেলার নাম পরিবর্তন করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ রাখা হয়।